পার্বত্য অঞ্চলে এক স্থানীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলে এক স্থানীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এই ভূমিধসের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকলেও প্রধান দুটি কারণ হল যথা (1) প্রাকৃতিক ও (2) মানবিক কারণ।

1. প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

(i) প্রচুর বৃষ্টিপাত : পার্বত্য অঞ্চলে অবিরাম অধিক বৃষ্টিপাত হলে পাথর, মাটি জলে ভিজে আলগা ও ভারী হয়ে যায়। তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে শিলাস্তূপ নীচে ধসে পড়ে। এই ভাবে অধিক বৃষ্টিজনিত মৃত্তিকা মধ্যস্থিত জলের ক্রমবর্ধমান চাপ ও ঢালে অবস্থিত পদার্থের আসঞ্চন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভূমিধস হয়ে থাকে। এই জন্য সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলে প্রতি বর্ষায় ধস নামে।

(ii) শিলা আলগা হওয়া : পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা শিলা ফেটে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ঐ দুর্বল শিলাখণ্ডগুলি বহুতলযুক্ত দারণ হওয়ার ফলে তারা আর ফাটলতলে থাকতে না পেরে, শিলাখণ্ডসহ মৃত্তিকাজাত পদার্থের স্তূপ ভূমি ধস স্বরূপ নীচে নামতে থাকে।

(iii) মৃত্তিকায় কণার প্রকৃতি : মৃত্তিকার কণার প্রকৃতি ভূমি ধসে সাহায্য করে। মৃত্তিকার গ্রথন (texture) বালি, পলি এবং কাদা কণার সমন্বয়ে গঠিত। যদি কোনো মাটিতে পলি এবং বালির তুলনায় কাদার ভাগ বেশি থাকে তাহলে সেই মাটির গ্রথন সূক্ষ্ম হয় ফলে জলের অনুপ্রবেশ কম হওয়ায় মৃত্তিকার ক্ষয় তথা ভূমিধস কম হয়। কিন্তু অনুরূপভাবে কোনো মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকলে সেই মাটির মধ্যে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে ফলে মাটি ভারসাম্য হারিয়ে ভূমি ধস সৃষ্টি করে।

(iv) ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের জন্য : প্রবল ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের সময় মাটি ও শিলাস্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তারা প্রতি মুহূর্তে কাঁপতে থাকে, ফলে ঐ শিলা কিংবা মৃত্তিকা ভূমিঢালের উপর দিয়ে বিচ্যুত হয়ে ভূমিধসের সৃষ্টি করে। আবার ভূকম্পনের বিভিন্ন তরঙ্গের ফলে প্রাকৃতিক আঘাত ও ধাক্কার ফলে ভূমিধসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

2. মানবিক কারণ (Manmade Causes)

(i) অরণ্য নিধন : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, যেমন তীব্র আকারে বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তেমনি চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বনজ দ্রব্যের। তাই মানুষ সরাসরি বনভূমিকে গ্রহণ করেছে। মানুষ বাসস্থানের জন্য বনভূমি পুড়িয়ে ফলেছে, আবার বনজ এবং অবনজ সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য বনভূমিকে ধ্বংস করছে। তারই ফলস্বরূপ গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে ফেললে মাটির উপরে তখন গাছপালা না থাকায় মাটির উপরের স্তর আলগা হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা ক্রমাগত ক্ষয় হয় এবং জল মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। ফলে ধস নামে।

(ii) রাস্তাঘাট ও বাড়ি নির্মাণ : বিশেষ করে পার্বত্য কিংবা উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে মনুষ্য বসতির জন্য পরিবহন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই পরিবহন পথ তথা সড়ক কিংবা রেলপথ নির্মাণের জন্য পাহাড় ফাটিয়ে পরিবহন পথ নির্মাণ করা হয়। বোমা কিংবা অন্যভাবে পাথরে আঘাত করার ফলে শিলাগুলি আলগা হয়ে ভূমি ঢাল বরাবর ধস নামে। একইভাবে দুর্বল ও খাড়াই পার্বত্য ঢালে যদি নিয়ম না মেনে উঁচু বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট তৈরি করা হয় তাহলে ধসের সৃষ্টি হয়।

(iii) কৃষিকাজ (Agriculture) : বস্তুর পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমি ধ্বংস কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ভূমিধস ছাড়াও কৃষিকাজের জন্য ভূমিধস হয়ে থাকে। পার্বত্য পরিবেশে মানুষের ফসল উৎপাদনের একমাত্র উপায় হল কৃষিকাজ। পার্বত্যবাসীরা খাদ্যের জন্য ধাপ কেটে কৃষিকাজ করে থাকে। কৃষিকাজ করার জন্য তারা শিলাকে কেটে সমতল ভূমি তৈরি করে। ঐ সময় বৃহৎ আকৃতির শিলাখণ্ডগুলি সংঘবদ্ধতা হওয়ার ফলে শিলাগুলি আলগা হয়ে যায়।

(iv) জনবসতি (Settlement) : কৃষিকাজ ও মনুষ্য বসতি প্রায় সম্পর্কযুক্ত। মনুষ্যবসতি ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়। তাই

4. পতন (Fall) : কোনো মাধ্যম ছাড়াই অভিকর্ষের প্রভাবে ঢালের বিভিন্ন উপাদানগুলির নীচে ধসে পড়ে যাওয়াকে পতন বলে। খাড়া ঢালে এই ধরনের পতন বেশি দেখা যায়। চ্যুতি তল বরাবর ঢালের এই ধরনের গতি লক্ষ করা যেতে পারে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিজ সম্পদ উত্তোলন, ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন অথবা ম্যাগমা উত্থানের ফলে এইরকম পতন দেখা যায়।

5. প্রবাহ (Flow) : প্রবাহ তিন ধরনের যথা—

(i) মৃত্তিকা প্রবাহ (Earth flow)

(ii) কর্দম প্রবাহ (Mud flow)

(iii) অবস্কর প্রবাহ (Debris avalanche)

পরস্পর সংযুক্ত ফাটল সমৃদ্ধ শিলা, ভূপৃষ্ঠস্থ এবং গভীর বিসর্পণ এবং অন্যান্য ধীরগতি সম্পন্ন মৃদু ঢালের পুঞ্জিত স্থানান্তর এর মৃত্তিকা প্রবাহ-এর অন্তর্গত এবং স্খলিত পদার্থের ধীরগতিতে প্রায় অনুভূমিক স্থানান্তর যা সান্দ্র তরলের মতো আচরণ তাকে কর্দম প্রবাহ বলা হয়ে থাকে।

6. টরেন্ট (Torrent) : এই ধরনের সঞ্চরণ প্রবাহ বা Flow-এর একটি অন্যতম তীব্র রূপ, কারণ এখানে সিক্ত কর্দম বা মৃত্তিকা বা অবস্কর (debris) নির্দিষ্ট খাত বরাবর দ্রুত নামতে থাকে।

7. স্লাম্প (Slump) : শিলা বা মৃত্তিকাখণ্ড নির্দিষ্ট ফাটল বরাবর ক্রমশ নীচে ধাপে ধাপে খানিকটা আবর্তন সহকারে বসে গেলে তাকে স্খলন বা স্লাম্প বলে। এই স্খলনের প্রাথমিক ধাপ থেকে মৃত্তিকা প্রবাহের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ভূমিধসের কারণ
Causes of Landslide

পুঞ্জিত ক্ষয়ের সর্বাপেক্ষা সাধারণ প্রক্রিয়া হল ভূমিধস (landslide)। যা সাধারণভাবে ধস নামে পরিচিত। পুঞ্জিত ক্ষয় হল মাটি ও আবহবিকারজাত উপাদানের বিচ্যুতি পরে পরিবহনের কোনো মাধ্যম ছাড়া শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঢাল বরাবর চলন বা পতন। ভূমিধসের সময় ভূত্বকের কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে যায়। ভূমিধস প্রধানত বন্ধুর

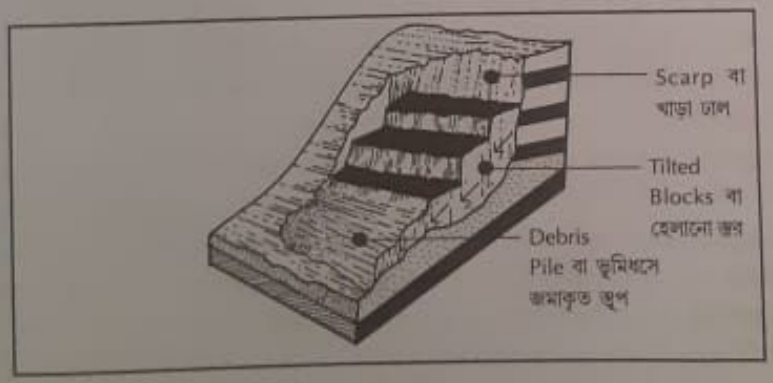

চিত্র : ভূমিধস

ভূমিধস
Landslide

ঢালু পার্বত্য অঞ্চলে যখন বিশাল অঞ্চল জুড়ে ঢালের অংশবিশেষ পাথর, উদ্ভিদ, বাড়িঘর, সড়ক পথ ঢাল বরাবর ভেঙে নীচের দিকে পড়ে যাওয়াকেই বলে ভূমিধস। পর্বতের গায়ে আবহবিকারজনিত বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে অভ্যন্তরীণ পীড়নের ফলে সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পীড়ন দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে পর্বতগাত্রের অভ্যন্তরীণ সংশক্তি বল বাহ্যিক চাপের থেকে কম হয়। অভ্যন্তরীণ সংশক্তি বলই পার্বত্য ঢালের শিলাস্তরকে বেঁধে রাখে কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংশক্তি বল দুর্বল হয়ে পড়লে শিলাস্তর আলগা হয়ে নীচে ধসে পড়ে যায়। এছাড়াও, আবহবিকার, নদী, হিমবাহ বা বায়ুর কার্যের ফলে যদি ঢাল খাড়া হয়ে যায়, ঢালের মান বাড়তে বাড়তে প্রায় 90° কাছাকাছি হয়ে যায়, এক্ষেত্রে অভিকর্ষজ শক্তির টানে পর্বতের গা থেকে শিলাস্তর নীচে ধসে পড়ে। অভিকর্ষজ বলের শক্তি বা প্রাবল্য অনেকটাই ঢালের কৌণিক মান এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে। একটি সমীকরণের সাহায্যে এটি সহজেই বোঝা যায়—

$F = W \sin \theta$

এখানে F = অভিকর্ষজ শক্তি

W = ঢালের নির্দিষ্ট অংশের উপর শিলা ও অন্যান্য পদার্থের ওজন

θ = ঢালের কৌণিক মান

ভূমিধসের প্রকারভেদ (Types of Landslide)

বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদেরা ভূমিধসকে প্রধানত সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন যথা—

1. **বিসর্পণ (Slide) :** ঢালের উপাদনগুলি শিলাস্তরের বিভেদ তলের সমান্তরালে বা ঢালের সমান্তরালে নীচের দিকে নেমে আসে।
2. **ধীর বিসর্পণ (Creep) :** ঢালের উপাদানগুলি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসে।
3. **টপ্‌ল (Topple) :** শিলাখণ্ড ভারসাম্য হারিয়ে মাথা গুঁজে উল্টে পড়ে।

মতো আচরণ তাকে কর্দম প্রবাহ বলা
6. **টরেন্ট (Torrent) :** এই ধরনের স
বা মৃত্তিকা বা অবস্কর (debris) নির্দি
7. **স্লাম্প (Slump) :** শিলা বা মৃত্তিক
বসে গেলে তাকে স্খলন বা স্লাম্প
থাকে।

ভূমিধসের কারণ
Causes of Landslide

পুঞ্জিত ক্ষয়ের সর্বাপেক্ষা সাধারণ প্র
হল মাটি ও আবহবিকারজাত উপাদা
ঢাল বরাবর চলন বা পতন। ভূমিধসে

ায়ী ব্যবস্থা
duce the
সগুলি হল
iii) গ্লোবাল
ব্যবস্থা করে
পুনর্গঠনের

মানুষজন ও
d services
য়ক্ষতি যতটা

CRISIS MANAGEMENT

ব্যবস্থাপনাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

1. প্রতিক্রিয়া (Response) : প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমেই আসে দুর্যোগ চলাকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী বা ক্ষণস্থায়ী দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বা উদ্ধারকার্য। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ব্যবস্থা নিলে ক্ষয়ক্ষতি যেমন কমানো যায় তেমনি ক্ষয়ক্ষতির আতঙ্ক থেকে মানুষজনকে দূরে রাখা যায় (measures taken in anticipation or during and immediately after a disaster to ensure that effects are minimized.)।

বিপর্যয় যদি ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির হয় তাহলে বিপর্যয় চলাকালীন ব্যবস্থা বলতে দুর্যোগের অব্যবহিত পরের ব্যবস্থাদি, যেটি মূলত উদ্ধার কার্য, যেমন ভূমিকম্প বা টর্নেডোর কথা বলা যেতে পারে। এদের স্থায়িত্ব কয়েক সেকেন্ড থেকে বড়োজোর কয়েক মিনিটের। এসব ক্ষেত্রে বিপর্যয় চলাকালীন কোনো ব্যবস্থা নেবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য উদ্ধার ও ত্রাণকার্য একসঙ্গে করা যায়। যেমন বন্যা। বন্যার সময় একদিকে জলময় অঞ্চলগুলি থেকে মানুষ পশু, সম্পত্তি ইত্যাদি উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হয়, তেমনি ত্রাণশিবিরে রেখে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হয়।

2. পুনরুদ্ধার (Recovery) : এটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত পর্যায়। এক্ষেত্রে বিপর্যয় এলাকার পুনর্গঠন (reconstruction) এবং বিপদগ্রস্ত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন (rehabilitation) সংক্রান্ত কাজকর্মকে বোঝায় (measures that support emergency and help the affected communities in the reconstruction of the physical infrastructure and reconstruction of economic and emotional well being.)। প্রথমেই রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হয়। তারপর ভেঙে যাওয়া বাড়ি, স্কুল, কলেজ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে আক্রান্তদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার উন্নতি তথা পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লোকজন কাছের লোককে হারিয়ে Trauma-য় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিংবা অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি। এরপর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার স্বার্থে আক্রান্তদের শুধু বাড়িঘর বানিয়ে দেওয়া নয়, তাদের আগামী কিছুদিনের জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। এই সবটাই পুনরুদ্ধারের (recovery) মধ্যে পড়ে।

বিপর্যয়কে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের খুব একটা নেই তবে বিভিন্ন স্তরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে। এবং এর জন্য দরকার সঠিক পূর্ব পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। এই প্রস্তুতি থাকলে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ঝুঁকি (risk)-কে কিছুটা অন্তত হ্রাস করা যায়, সন্দেহ নেই।

বিপন্নতা (Vulnerability)

দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিপন্নতা এক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বিপন্নতা বা Vulnerability হল বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, বিপন্নতা বলতে ব্যাপক অর্থে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপদকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। প্রত্যেক বছরে কয়েক লক্ষাধিক মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপর্যয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিপন্নতা নির্ভর করে দুর্যোগের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। বিপন্নতা বেশি হবে যদি বিপন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি হবে। বিপন্নতা বৃদ্ধি পায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিপন্ন মানুষের প্রযুক্তির অভাব, সামাজিক সচেতনতার অভাব ইত্যাদি থেকে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে দুর্বল ভূতাত্ত্বিক গঠনের ওপর যদি অবৈজ্ঞানিক ভাবে বাড়ি তৈরি ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবহার করা হয়, তাহলে বিপন্নতার মাত্রা বাড়ে। বিপন্নতা এবং দুর্যোগ (hazard) থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা
Disaster Management

যে কোনো বিপর্যয় সামাল দেবার যে কৌশল বা প্রক্রিয়া তাকেই বলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (disaster management is a process or strategy that is implemented when any type of catastrophic even takes place.)। বাস্তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আর তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় এই বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতিকে যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা। এই চেষ্টা তিনভাবে করা যায় যথা—

A. বিপর্যয় ঘটার আগে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকে যাকে Predisaster management বলে।

B. বিপর্যয় চলাকালীন ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কিছু ব্যবস্থা যাকে Disaster occurence management বলে।

C. বিপর্যয় পরবর্তী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যাকে Post-disaster management বলে।

বিপর্যয় ঘটার আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

1. বিপর্যয় প্রতিরোধ (Disaster Prevention) : কোনো অঞ্চলে বিপর্যয়ের সংখ্যা এবং তীব্রতা কমানোর ব্যবস্থাকে বিপর্যয় প্রতিরোধ (prevention) বলে (measures to eliminate or reduce the incidence or severity of emergencies or disasters.)। এই স্তরে প্রথমেই যে অঞ্চল বিপর্যয়প্রবণ সেই অঞ্চলের সমীক্ষা করে জানতে হবে

...সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

কোনো একটি স্থানে যখন দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেই স্থানে পরবর্তী সময়ে যেন দুর্যোগ সংঘটিত না হয় সেজন্য কতকগুলি দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়। 10 অক্টোবর হল বিশ্ব দুর্যোগ লঘুকরণ দিবস।

বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাগুলি প্রচলিত তা হল—

1. **ঝুঁকির মূল্যায়ন (Risk assessment)** ঃ কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কী কী ধরনের ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে তার সম্ভাব্য কারণ, প্রতিকার কী আছে তার মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।
2. **পরিকল্পনা (Planning)** ঃ যদি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তার সম্ভাব্য কারণ, সময় ও ব্যাপকতা জানা যায় তাহলে অতি সহজেই তার মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।
3. **সতর্কীকরণ (Warning)** ঃ এমন সব বিপর্যয় আছে যেখানে সতর্কীকরণের কোনো সময় থাকে না। তাই সতর্কীকরণ এমন একটি কাজ যা সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে সঠিকভাবে সঠিক মানুষকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জানানো ভীষণ প্রয়োজন।
4. **জনশিক্ষা (Education)** ঃ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি করা এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়িত্বশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি কাজ।
5. **তথ্য আদান-প্রদান (Information)** ঃ বিপর্যয় মোকাবিলায় দুর্যোগের পূর্বের, মধ্যের ও পরের তথ্যের সঠিক আদান-প্রদান অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
6. **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো (Institutional Infrastructure)** ঃ বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন পেশাদারি প্রতিষ্ঠান যেমন— সেনাবাহিনী, আবহাওয়া দপ্তর, পুলিশ বাহিনী, দমকল বিভাগ, পূর্ত দপ্তর, বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান অত্যন্ত জরুরি।

(ii) আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi-Natural Hazards) : বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, দাবানল, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে হলেও মানুষের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এইসব দুর্যোগ সাধনে সাহায্য করে। মানুষের কার্যকলাপের ফলে নদীর খাত মজে যাবার কারণে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, আধা-শুষ্ক অঞ্চলে এমনকি আর্দ্র অঞ্চলেও অবৈজ্ঞানিকভাবে জলসম্পদ ও ভূমির ব্যবহার খরা ডেকে আনতে পারে। দুর্ভিক্ষ, দাবানলের প্রসঙ্গে এই একই কথা বলা যায়। পার্বত্য ঢালে অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য বা নগরায়ণের ফলে ভূমিধসের প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এগুলি আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi-natural Hazard)।

(iii) মনুষ্যকৃত দুর্যোগ (Manmade Hazards) : যদি কোনো অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর সম্পদ ও জীবনহানি হয় এবং জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনো এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, অথবা যুদ্ধের সময় বিরোধী এলাকায় বোমা, রকেট ইত্যাদির সাহায্যে এলাকাটি শ্মশান করে দেওয়া হয় কিংবা যদি বিষাক্ত রাসায়নিক বা মারণরোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তবে এইসব দুর্যোগ সাধনে প্রকৃতির কোনো হাত থাকে না। এইসব দুর্যোগই হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। যেমন 1984-এর ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Natural and Manmade Hazard)

দুর্যোগকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যার মধ্যে অন্যতম হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সংজ্ঞা : যে সকল দুর্যোগ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবক্ষয় বা অবনমনের ফলে সৃষ্টি হয়, তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। অন্যদিকে যে সকল দুর্যোগ মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট হয় তাকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ বলে।

(ii) এলাকাগত পার্থক্য : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃহৎ স্কেলে সংঘটিত হয়, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র স্কেলে সংঘটিত হয় (ব্যতিক্রম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ)।

(iii) গতিবেগ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধীর বা দ্রুত উভয় গতিতে হয়। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ তাৎক্ষণিক ও দ্রুত সংঘটিত হয়।

(iv) নিয়ন্ত্রণ : প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিরোধ করা যায় না, তবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগকে মনুষ্য সচেতনতার দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(v) পারস্পরিক প্রভাব : প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রকৃতির কোনো প্রভাব থাকে। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে প্রকৃতির কোনো প্রভাব থাকে না।

(vi) সময় : প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক হয়।

(vii) উদাহরণ : ভূমিধস, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদ্গম হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অপরদিকে যুদ্ধ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ইত্যাদি হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ।

দুর্যোগের বিভাগ
Types of Hazards

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

(i) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Hazards) : ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলির ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে অসহায়।